

মিয়ারুল মাযাহিব (ধর্ম যাচাইয়ের মানদণ্ড)



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

মিয়ারুল মাযাহিব (ধর্ম যাচাইয়ের মানদণ্ড)

মিয়ারুল মাযাহিব (ধর্ম যাচাইয়ের মানদণ্ড)



হযরত মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মিয়ারুল মাযাহিব (ধর্ম যাচাইয়ের মানদণ্ড)

গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)
ভাষান্তর	মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত
প্রকাশকাল	১ম প্রকাশ: জুন ২০২৬
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণে	বাড-উ-লিভস্ বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Mi'yarul Mazahib
(The Criterion for
Religions)

মিয়ারুল মাযাহিব
(ধর্ম যাচাইয়ের মানদণ্ড)

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian**
The Promised Messiah and Imam Mahdi^{as}

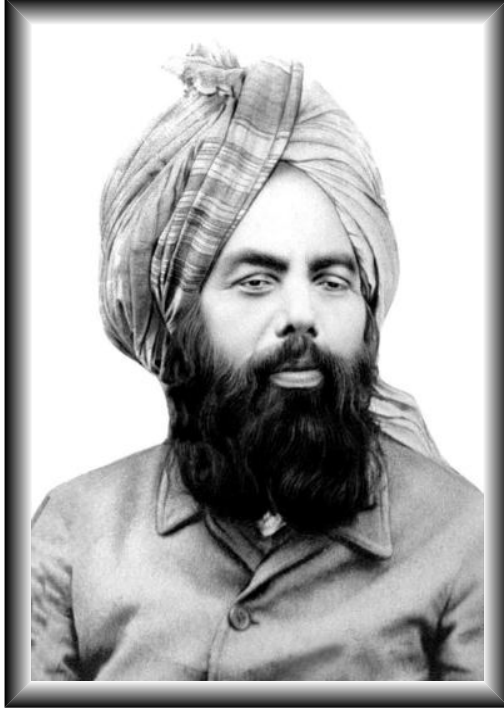
Translated into Bangla by
Markazi Bangla Desk, UK

1st Published in Bangladesh in June 2026

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publications Ltd., UK**
ISBN 978-984-991-071-8

লেখক পরিচিতি



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসে এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও ফলপ্রসূ লেখক, গবেষক এবং ধর্মতাত্ত্বিক; অন্যদিকে ছিলেন আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেমানুরাগী ও রসূলপ্রেমে নিবেদিত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন, সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনা এই দুটি ধারাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ছিলেন এক নজিরবিহীন সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় ৮০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখাগুলি কেবল সংখ্যায় বিপুল নয়, বরং বিষয়বস্তুর গভীরতা, যুক্তিতর্কের বলিষ্ঠতা এবং সাহিত্যের দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর লেখার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত আদর্শ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া আর ইসলামের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি খ্রিষ্টান মিশনারি ও আর্যসমাজীদের প্রবল

আক্রমণের মুখে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

তিনি পবিত্র কুরআনের এমনসব গভীর ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন, যা আধুনিক যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। এছাড়া তিনি নিজের দাবির পক্ষেও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এই দাবির সমর্থনে ঐশী নিদর্শন ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

তাকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু- এই তিনটি ভাষার একজন দক্ষ লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর আরবী রচনায় অলংকারশাস্ত্রের এমন ব্যবহার দেখা যায়, যা তৎকালীন আরবী পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করেছিল। তাঁর লেখা তর্ক, যুক্তি, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির এক অপূর্ব মিশ্রণ।

মির্য়া গোলাম আহমদ সাহেবের সাহিত্যকর্ম তাঁর হৃদয়ের গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আল্লাহর নৈকট্য ও সম্ভ্রুতি লাভের সাধনায় নিবেদিত। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এতটাই গভীর প্রেম ও আনুগত্য দেখিয়েছেন যে তাঁর দাবি হলো- এই প্রেমের মাধ্যমেই তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে মসীহ মওউদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

তিনি তাঁর ঐশ্বরিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে ১৯০৮ সালের ২৬ মে তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পুনরায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সালে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মির্য়া বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর হযরত হাফেয মির্য়া নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে তাঁর তিরোধানের পর হযরত মির্য়া তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। এরপর তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। ২০০৩ সালে হযরত মির্য়া মসরুর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ঐশী জামা'ত বর্তমানে বিশ্বের ২২০টি দেশে খাঁটি ইসলাম প্রচার করে চলেছে।

ভূমিকা

‘ধর্ম যাচাইয়ের মানদণ্ড’ পুস্তিকাটি ১৮৯৫ সালে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত ‘মিয়ারুল মাযাহিব’-এর বাংলা অনুবাদ। এতে হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ইসলাম- এই তিনটি প্রধান ধর্মের একটি বিস্তারিত তুলনা করা হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এখানে একটি প্রাকৃতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন, কেন হিন্দুধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম সেই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশক্তিমান খোদার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে যা ইসলাম ঘোষণা করে।

হিন্দুধর্মের ‘খোদা’র ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তার ভূমিকা কেবল একজন রাজমিস্ত্রির মতো, যিনি কেবল আগে থেকে বিদ্যমান বস্তুগুলোকে জোড়া দেন এবং স্রষ্টা হিসেবে তার কোনো ভূমিকা নেই। অপরদিকে খ্রিষ্টধর্মের ‘খোদা’কে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তাদের খোদা তাঁর অনুসারীদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন- এটি খ্রিষ্টানদের আরো একটি উদ্ভাবন। মানুষকে ঈশ্বর বানানোর এই ধারণাটি ব্রাহ্মণরা উদ্ভাবন করেছিল, যাদের কাছ থেকে গ্রিকরা এটি গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে গ্রিকদের কাছ থেকে খ্রিষ্টানরা এটি ধার করে। খ্রিষ্টীয় ‘প্রায়শ্চিত্ত’ মতবাদ কেবল পাপ করতে উৎসাহিত করে এবং পাপাচার, অধর্ম ও সব ধরনের মন্দ কাজকে অবাধে ছড়াতে দেয়।

আল্লাহ সম্পর্কে হিন্দুধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম ধর্মের খোদা-দর্শন সম্পর্কে বলেন, ‘এ ধর্মে খোদা অন্বেষণের পছা অত্যন্ত স্পষ্ট ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সকল ধর্মের পুস্তকাবলি যদি বিনষ্ট হয়ে যায় আর সেগুলোর সকল শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ধনধারণা ও মতবাদও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবুও সেই খোদা যাঁর প্রতি কুরআন পথপ্রদর্শন করে প্রাকৃতিক নিয়মের দর্পণে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হবেন এবং তাঁর শক্তি ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ মুখাবয়ব প্রতিটি অণুপরমাণুতে সমুজ্জ্বল দেখা যাবে।’ এ দাবি বইটিতে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যাতে খোদা সম্পর্কে ইসলামী ধারণার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক অন্তর্ভুক্ত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো এ বইটির

বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে। মরক্কীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে জামা'তের একদল মুরব্বী সিলসিলা এ বইটির বঙ্গানুবাদের কাজ সমন্বিতভাবে সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তা'লা এদেরকে এবং যারা যেভাবে বইটি প্রকাশের কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন।

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী.

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

জুন ২০২৬

অনুবাদকদের বিষয়ে নিবেদন

মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে ‘মিয়ারুল মাযাহিব’ তথা ‘ধর্ম যাচাইয়ের মানদণ্ড’ পুস্তিকাটি অনূদিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। পুস্তিকাটির অনুবাদের ক্ষেত্রে একদল মুরব্বী সিলসিলা সেবা প্রদান করেছেন। হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে খাকসারের সাথে লন্ডন, ঢাকা এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত কর্মীদের একটি দল নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা’লার কৃপায় সবার সম্মিলিত প্রয়াসে পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাই সংশ্লিষ্ট সবার জন্য বিনীতভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি। আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বলছি— আমরা পাঠকদের সামনে যথাসাধ্য সহজবোধ্যরূপে মূল পুস্তকের অনুবাদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। কোথাও যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে থাকে, তবে সেটি আমাদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে, আর যে-কোনো সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা নিঃসন্দেহে লেখকের সত্যতা ও আল্লাহর বিশেষ কৃপা থেকেই উৎসারিত।

আমরা বিনীতভাবে পাঠকদের নিকট দোয়ার আবেদন রাখছি— আল্লাহ তা’লা যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন, আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন এবং এই পুস্তিকাটি সত্যের অনুসন্ধানীদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা’লা লেখক, অনুবাদকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সম্ভৃষ্টির উত্তরাধিকারী করুন আর আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, আমীন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুস্তিকাটি ছাপার ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাই আমরা তাঁর প্রতি ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

ওয়াসসালাম



ফিরোজ আলম

ইনচার্জ

মরকযী বাংলা ডেস্ক

ইউকে

জুন ২০২৬

অনুবাদ ও এর সম্পাদনায়



- ১) মাওলানা সাব্বির আহমদ
- ২) মাওলানা মামুন-উর-রশীদ
- ৩) মাওলানা মোমিন হোসেন
- ৪) মাওলানা নিয়ামুল হাসান
- ৫) মাওলানা আবু সাঈদ আহমদ মণ্ডল
- ৬) মাওলানা মসীহ উর রহমান
- ৭) মাওলানা নাভিদুর রহমান
- ৮) মাওলানা তারিফ আহমদ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১) বিভিন্ন ধর্মকে যাচাই-বাছাই করার সবচেয়ে বেশি সুযোগ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের—	১
২) ভারতবর্ষের অধিবাসীদের প্রতি আল্লাহর তিনটি অনুগ্রহ—	৩
৩) তিনটি প্রধান ধর্মের উল্লেখ—	৪
৪) আর্যধর্মে খোদা-দর্শন—	৫
৫) খ্রিষ্টধর্মে খোদা-দর্শন—	৭
৬) শিখ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে, গুরু নানক মৃত্যুর পর স্বশরীরে জন্মাতে চলে গেছেন—	৯
৭) ইসলাম ধর্মে খোদা-দর্শন—	২২
৮) ‘রাব্বুল আরশ’ বলতে কী বুঝায়?	২৬

سوال ۸

معیار المذاهب فطری معیار سے مذاہب کا مقابلہ

از تصنیف

حضرت سید موعود علیہ السلام

۱۸۹۵ء سالے مودیت 'میارل ماہاب' ٲوتکار
مول ٹاہٹل ٲلر ٲرلرل

মিয়ারুল মাযাহিব

প্রকৃতিগত মানদণ্ডে বিভিন্ন ধর্মের
তুলনামূলক পর্যালোচনা

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

১৮৯৫ সালে মুদ্রিত ‘মিয়ারুল মাযাহিব’ পুস্তিকার
মূল টাইটেল পেজের অনুবাদ

প্রকৃতিগত মানদণ্ডে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহের কিছু স্মৃতিচারণ

আমার মতে, বিভিন্ন ধর্মকে যাচাই-বাছাই করার এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার জন্য কোনো দেশের বাসিন্দাদের এর চেয়ে উত্তম সুযোগ পাওয়া অসম্ভব, যা আমাদের দেশ পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষ লাভ করেছে। আমাদের দেশে ইংরেজদের শাসন হলো এই সুযোগ লাভের পেছনে আল্লাহ তা'লার প্রথম অনুগ্রহ। আমরা চরম অকৃতজ্ঞ এবং নিমকহারাম সাব্যস্ত হবো, যদি আমরা পরম আন্তরিকতার সাথে এই অনুগ্রহশীল সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করি; যাদের কল্যাণময় সত্তার মাধ্যমে আমরা সত্যের প্রতি আহ্বান এবং ইসলাম প্রচারের সেই সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি যা আমাদের পূর্বে কোনো রাজা-বাদশাও পায় নি। কেননা এই শিক্ষানুরাগী সরকার মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন স্বাধীনতা প্রদান করেছে যার দৃষ্টান্ত যদি অন্য কোনো রাষ্ট্রে আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে তা পাওয়া দুষ্কর। এটি কি বিস্ময়কর বিষয় নয় যে, আমরা লন্ডনের বাজারে-বন্দরে ইসলাম ধর্মের পক্ষে সেসব বক্তব্য প্রদান করতে পারি যা বিশেষ করে পবিত্র মক্কা নগরীতে দেওয়া অসম্ভব। আর এ সরকার শুধুমাত্র বইপুস্তক প্রকাশ এবং ধর্মপ্রচারেই প্রত্যেক জাতি ও ধর্মকে স্বাধীনতা প্রদান করে নি, বরং স্বয়ং প্রত্যেক ফিরকা বা দলকে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে সাহায্য করেছে এবং শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপকতার মাধ্যমে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর চোখ খুলে দিয়েছে।

অতএব যদিও এই হিতৈষী সরকারের এই অনুগ্রহও কোনো অংশেই কম নয় যে, তারা আমাদের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের সাধ্যানুযায়ী আন্তরিকভাবে সুরক্ষা করে চলেছে। আর এই স্বাধীনতা দ্বারা আমাদের উপকার সাধন করে চলেছে যার পথপানে চেয়ে থেকে আমাদের পূর্বে মানুষের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতিশীল অনেক (মানুষ) আক্ষেপ করতে করতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু সরকারের দ্বিতীয় অনুগ্রহটি এর চেয়েও মহান। অর্থাৎ তারা বন্য পশুসুলভ এবং নামেমাত্র মানুষকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হিসেবে গড়ে তুলতে চান। আমরা দেখি যে, এই সরকারের অবিরাম চেষ্টার মাধ্যমে সেসব মানুষ, যারা বলতে গেলে প্রায় গবাদি পশু ও চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় ছিল; তারা মানুষত্ব, জ্ঞান ও দূরদর্শিতার কিছু কিছু অংশ লাভ করেছে। আর অধিকাংশ মনমস্তিকে এমন এক জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে যা শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের পরেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি যেন পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে, কিন্তু যেভাবে কাঁচ ভেদ করে আলো ঘরে প্রবেশ করতে পারলেও পানি আসতে পারে না, একইভাবে জ্ঞানের আলো মনমস্তিকে জায়গা করে নিলেও নিষ্ঠা এবং সত্যমুখী হবার সেই বিশুদ্ধ পানি ভেতরে প্রবেশ করে নি, যা দ্বারা আত্মরূপী চারাগাছ বিকশিত হয় এবং উত্তম ফল বয়ে আনে। কিন্তু এটি সরকারের দোষ নয়, বরং এখনও এমন উপকরণাদি হয়ত নেই বা থাকলেও সংখ্যায় নিতান্তই কম রয়েছে যা সত্যিকার আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বেলিত করতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জ্ঞানগত উন্নতির পাশাপাশি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনাও যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এবং সত্যাপূজারীদের অসহনীয় কুমন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশ্বাসজনিত সরলতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। আর ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সংগতিবিহীন দার্শনিক চিন্তাধারা, নব্য-শিক্ষিত মানুষদের ওপর এক বিষাক্ত প্রভাব ফেলেছে, যা (তাদেরকে) নাস্তিকতার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আর এসব প্রভাব থেকে ধর্মীয় শিক্ষার সুরক্ষা বলয় ছাড়া মানুষের রক্ষা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

পরিতাপ সেই ব্যক্তির জন্য! যে স্কুল এবং কলেজে এমন এক পরিস্থিতির শিকার যে, ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং সত্য শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তবে আমরা বলতে পারি, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এই দৃঢ়প্রত্যয়ী সরকার এই রাষ্ট্রের পতিত-পরিত্যক্ত বিরোধভূমি-সদৃশ মন মস্তিকে, নিজ প্রচেষ্টায় আগাছা, ঝোঁপ-ঝাড় এবং বিভিন্ন ধরনের ঘাসমুজ্ব করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছে যা অনেক লম্বা ও ঘন হয়ে ভূমিকে ঢেকে ফেলছিল। এখন স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় এসে গেছে যখন সত্যের বীজ এই ভূমিতে বপন করা হবে আর ঐশী পানি দ্বারা সিস্কিত হবে। কাজেই সেসব মানুষ বড়োই সৌভাগ্যবান, যারা এই কল্যাণময় সরকারের সাহায্যে ঐশী বারির সন্নিবর্তিত হয়েছেন। মুসলমানদের উচিত, এই সরকারকে খোদা তা'লার কৃপা জ্ঞান করা আর তার সত্যিকার আনুগত্যের প্রচেষ্টায় এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেন তারা

অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ গণ্য হন। অনুগ্রহের প্রতিদান কি অনুগ্রহ নয়? পুণ্যের বিনিময়ে পুণ্য করা কি অপরিহার্য নয়? অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন এ বিষয়ে প্রণিধান করে এবং নিজের পুণ্যের শক্তি প্রদর্শন করে। ইসলামী শরীয়ত কারো অধিকার এবং অনুগ্রহকে খর্ব করতে চায় না। কাজেই কপটতার আশ্রয় নিয়ে নয়, বরং পরম নিষ্ঠার সাথে এই অনুগ্রহশীল সরকারের প্রতি অনুগত থাকা উচিত; কেননা আমাদের ধর্মের আলো বিস্তৃত করার জন্য আল্লাহ তা'লা প্রথম ব্যবস্থা এটিই হাতে নিয়েছেন।

এছাড়া বিভিন্ন ধর্মকে জানার জন্য আমাদের দেশে দ্বিতীয় যে মাধ্যমটি সামনে এসেছে তা হলো, ছাপাখানার আধিক্য। কেননা এমনসব গ্রন্থ— যা বলতে গেলে ভূগর্ভে চাপা পড়ে ছিল, এসব ছাপাখানার মাধ্যমে (তা) যেন পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছে। এমনকি হিন্দুদের বেদও নতুন পৃষ্ঠার মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে, (মনে হচ্ছে) যেন নবজন্ম লাভ করেছে আর আহাম্মক ও সাধারণ মানুষের মনগড়া গল্প কাহিনির গোমর ফাঁস হয়ে গেছে।

তৃতীয় মাধ্যমটি হলো, নূতন নূতন রাস্তাঘাট এবং উত্তম ডাকব্যবস্থা, দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে বইপুস্তক আসা এবং এ দেশ থেকে সেসব দেশে যাওয়া। এসব হলো সত্য সম্পর্কে গবেষণার মাধ্যম, যা খোদার অনুগ্রহ আমাদের দেশে সহজলভ্য করে দিয়েছে; পূর্ণ স্বাধীনতার কল্যাণে এর মাধ্যমে আমরা উপকৃত হচ্ছি। এসব সুযোগ-সুবিধা এই অনুগ্রহশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী সরকারের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি, যার জন্য আমাদের হৃদয় থেকে অবলীলায় দোয়া বের হয়। কিন্তু যদি এই প্রশ্ন করা হয়, যেখানে মানুষকে খোদা বানিয়ে সত্যিকারের খোদার প্রকাশ্য, অনাদি এবং অপরিবর্তনশীল মহিমার অবমাননা করা হয়— এমন সুসভ্য ও বিচক্ষণ সরকার কেন এমন ধর্মের অনুসরণ করে? সুতরাং পরিতাপের বিষয় হলো, এই প্রশ্নের উত্তর এটি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, রাজা-বাদশাদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার ধ্যানধারণা যখন স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন পরিকল্পনা ও বিচারবিশ্লেষণের সাকুল্য শক্তি এর পেছনেই ব্যয় হয়ে যায়। জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পারলৌকিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ দেবার সুযোগই দেয় না। একইভাবে নিরবচ্ছিন্ন পার্থিবতার মোহে আচ্ছন্ন হবার কারণে খোদাকে চেনা ও সত্যসন্ধানের মনোভাব ক্ষীণ হতে থাকে। তবুও খোদা তা'লার কৃপায় আমরা নিরাশ নই যে, তিনি এই দৃঢ়প্রত্যয়ী সরকারের দৃষ্টি সরল-সঠিক পথের

দিকে নিবদ্ধ করবেন। যেভাবে এ সরকারের পার্থিব কল্যাণের জন্য আমরা দোয়া করি, একইভাবে পারলৌকিক কল্যাণের জন্যও করি। অতএব দোয়া গৃহীত হয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এ যুগে যেখানে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য বহু মাধ্যমের উদ্ভব ঘটেছে, আমাদের দেশে তিনটি বৃহৎ ধর্ম একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। এ তিনটি ধর্মের মধ্য থেকে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীর দাবি হলো, আমার ধর্মই সত্য ও সঠিক। আর মজার বিষয় হলো, কেউই একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে, তার ধর্ম সত্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমাদের বিরোধীরা মৌখিকভাবে যে দাবি করে, আমি এক সেকেন্ডের জন্যও ভাবতে পারি না যে, তাদের হৃদয়ও তাদের মৌখিক দাবির সাথে সহমত রাখে। সত্য ধর্মের একটি বড়ো চিহ্ন হলো, আমরা এর সত্যতার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার পূর্বেই সেটি আপন সত্তায় স্বয়ং এরূপ উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান হয়ে থাকে যে, অন্য ধর্মগুলোকে যদি এর বিপরীতে রাখা হয় তাহলে সেগুলো সবই অন্ধকারে নিমজ্জিত বলে প্রতিভাত হয়। বর্তমানে একজন বিচক্ষণ মানুষ এই দলিলটিকে স্পষ্টভাবে তখনই বুঝতে পারবে যদি প্রত্যেক ধর্মকে এর বানানো যুক্তি থেকে পৃথক করে শুধুমাত্র এর মৌলিক নীতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অর্থাৎ সেসব ধর্মের স্রষ্টাকে চেনার পদ্ধতিকে শুধুমাত্র পরস্পরের বিপরীতে বা সমান্তরালে রেখে যাচাই করে এবং কোনো ধর্মের খোদাকে চেনার পদ্ধতির সাথে বহিরাগত দলিল-প্রমাণের টিকাটিপ্পনি সংযুক্ত না করে, বরং অন্য সব দলিল থেকে মুক্ত করে এক ধর্মকে অন্য ধর্মের বিপরীতে রেখে পরখ বা যাচাই করে এবং চিন্তা করে যে, কোন ধর্মে অন্তর্নিহিত সত্যের ঔজ্জ্বল্য বিদ্যমান আর কোন ধর্মে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, শুধুমাত্র তাদের খোদাকে শনাক্ত করার রীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করাই হৃদয়কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ, আমি এখনই যে তিনটি ধর্মের উল্লেখ করে এসেছি সেগুলো হলো- ১) আর্য ২) খ্রিষ্ট ৩) ইসলাম। আমরা যদি এই তিনটির আসল রূপ দেখাতে চাই তাহলে তা নিম্নরূপ:

আর্যধর্মের এমন এক খোদা রয়েছেন, যার ঈশ্বরত্ব শক্তি ও সামর্থ্যে ক্রিয়াশীল থাকা অসম্ভব। কেননা তার সকল আশা-ভরসা এমনসব সত্তার ওপর যারা তার নিজের হাতে সৃষ্ট নয়। সত্যিকার খোদার ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা সম্পর্কে অবগত হওয়া মানুষের সাধ্যাতীত, অথচ আর্যদের পরমেশ্বরের

ক্ষমতা হাতের আঙুলে গণনা করা সম্ভব। তিনি এমন সীমিত ক্ষমতার এক পরমেশ্বর, যার ক্ষমতার পরিধি (কী- তা) জানা হয়ে গেছে। তার ক্ষমতার প্রশংসায় সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তিনি নিজের মতো প্রাচীন জিনিসগুলোকে মিস্ত্রিদের মতো শুধু জোড়াতালি দিতে জানেন। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, নিজের পক্ষ থেকে কোনোকিছু যোগ করেন কি? তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, কিছুই না। মোটকথা, তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেবল এতটুকু, তিনি নিজের মতো প্রাচীন, অনাদি, নিজ সত্তায় বিদ্যমান অবিনশ্বর আত্মা এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুগুলোর মাঝে কেবল জোড়াতালি লাগিয়ে থাকেন। এদের সৃষ্টিতে তার সত্তার কোনোই ভূমিকা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো যুক্তি দাঁড় করানো দুরূহ যে, কেন এসব প্রাচীন বস্তু এমন পরমেশ্বরের মুখাপেক্ষী হবে, যখনকিনা সকল বস্তু স্বয়ম্ভু, তাদের সকল শক্তিবৃত্তিও নিজ থেকে বিদ্যমান এবং তাদের পরস্পর মিলিত হবার শক্তিও স্বয়ংক্রিয়। এদের মাঝে আকর্ষণ ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবার শক্তিও প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। গঠন ও বিন্যাসের পর প্রকাশিত তাদের সকল বিশেষ বৈশিষ্ট্যও স্বয়ম্ভু; তাই এই দুর্বল ও অক্ষম পরমেশ্বরের যে কোনোকিছুর প্রয়োজন রয়েছে তা কোনোভাবে বোধগম্য নয়। এর এবং অন্যদের মাঝে অধিক চতুর ও মেধাবী হওয়া ছাড়া আর কী পার্থক্য হতে পারে! এতে কোনো সন্দেহ আছে কি যে, আর্যদের পরমেশ্বর ঈশ্বরত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত অসীম শক্তি ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত? এটি সেই কল্পিত পরমেশ্বরের দুর্ভাগ্য যে, সে সেই পূর্ণাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে নি- যা ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণ প্রতাপ প্রকাশের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য হলো- বেদের কয়েকটি পৃষ্ঠা ব্যতীত প্রাকৃতিক বিধানের আলোকে তাকে শনাক্ত করার অন্য কোনো পন্থা নেই। কেননা একথা যদি সত্য হয় যে, আত্মা (রূহ) এবং অণুপরমাণু স্বীয় সমস্ত শক্তি, আকর্ষণ ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্যাবলি, বুদ্ধিমত্তা, বোধ-বুদ্ধি এবং চেতনার নিরিখে স্বয়ম্ভু ও অনাদি তাহলে এক সুস্থ বিবেক এসব বস্তুকে সংযুক্ত করার জন্য কোনো ভিন্ন ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মানতে পারে না।

কারণ এমতাবস্থায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব- যে-সব বস্তু আদি থেকে নিজেই নিজ সত্তার ঈশ্বর এবং নিজেদের মাঝে সেসব শক্তিও ধারণ করে যা তাদের পারস্পরিক সংযুক্তির জন্য অপরিহার্য, তাহলে যেখানে তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য পরমেশ্বরের মুখাপেক্ষিতার প্রয়োজন পড়ে নি এবং

নিজেদের শক্তিনিচয় ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে কোনো শ্রুষ্ঠার মুখাপেক্ষী হয় নি; তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য অন্য কোনো জোড়াতালি দানকারীর প্রয়োজন পড়ল কেন? অথচ আত্মার সাথে তাদের শক্তিবৃত্তিকে যুক্ত করা এবং বস্তুর অণুপরমাণুর তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে শক্তিসামর্থ্যকে সম্পৃক্ত করাও একপ্রকার সংযুক্তিকরণ। কাজেই একথা থেকে প্রমাণিত হলো, সেসব আদি বস্তুর জন্য যেভাবে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য কোনো শ্রুষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে নি এবং নিজেদের শক্তিসামর্থ্যের জন্যও কোনো উদ্ভাবকের প্রয়োজন নেই, একইভাবে পরস্পর সংযুক্ত হবার জন্যও কোনো নির্মাতার প্রয়োজন নেই। যদি প্রথমে নিজ মুখেই স্বীকার করেন যে, তারা নিজেদের অস্তিত্ব, শক্তিসামর্থ্য এবং পরস্পর সংযুক্ত হবার জন্য অন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়; আবার একই মুখে এটিও বলবেন যে, কোনো কোনো জিনিসকে জোড়া লাগানোর জন্য অবশ্যই অন্য কারো প্রয়োজন রয়েছে তাহলে এটি চরম নির্বুদ্ধিতা হবে। কাজেই এটি কেবল একটি দাবি হবে যার অনুকূলে কোনো প্রমাণ নেই।

মোটকথা, এ বিশ্বাস অনুযায়ী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই কঠিন হবে। অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে বড়ো দুর্ভাগা আর কেউ নেই, যে এমন পরমেশ্বরের ওপর আস্থা রাখে, যে শক্তির অভাবে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যও কোনো উত্তম উপকরণ খুঁজে পায় নি। এই হলো হিন্দুদের পরমেশ্বরের মাঝে ঐশ্বরিক শক্তির স্বরূপ। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ হলো তাকে মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকেও অধঃপতিত বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন- আমরা দেখতে পাই, একজন দয়ালু মানুষ অসংখ্য বার এমন অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, যে অনুনয়-বিনয় করে তার কাছে ক্ষমা চায়। আর অসংখ্য বার নিজের দয়াদ্র্দিগন্ততার কারণে এমন লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে, যাদের ক্ষমা পাবার কোনো অধিকারই নেই। কিন্তু আর্থরা তাদের পরমেশ্বরের সম্পর্কে বর্ণনা করে যে, তিনি এই উভয় প্রকার গুণ বা বৈশিষ্ট্য থেকেও রিজহস্ত। তাদের মতে প্রতিটি পাপ কোটি কোটি বার পুনর্জন্মের কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পাপী অসংখ্য বার (বিভিন্ন আকৃতিতে) জন্মান্তরিত হয়ে পুরো শাস্তি ভোগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তির কোনো উপায় নেই। আর তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের তওবা, অনুশোচনা ও এন্তেগফার তাকে পুনর্জন্মের চক্রে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করবে অথবা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা অতীতের অন্যায় কথা ও কাজের শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করবে- এটি একেবারেই

দূরাশা; বরং অসংখ্য পুনর্জন্মের চক্র ভোগ করা আবশ্যিক, যা কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। উদারতা ও বদান্যতাবশত ক্ষমা করে দেওয়া তো পরমেশ্বরের স্বভাবেরই নেই! কোনো মানুষ বা পশুর যদি উত্তম গুণাবলি থেকে থাকে কিংবা কোনো নিয়ামত লাভ করে তবে সেটা (মূলত) পূর্বের কোনো জন্মেরই পরিণাম।

পরিতাপ! বেদের নীতিমালার বিষয়ে আর্যদের অনেক গর্ববোধ থাকা সত্ত্বেও বেদের এই ভ্রান্ত শিক্ষা তাদের মনুষ্যত্বকে পরাস্ত করতে পারে নি। এই ফিরকার বিভিন্ন লোকের সাথে প্রায়শ আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। তাতে এ বিষয়টি বার বার আমি উপলব্ধি করেছি, ‘নিয়োগ’-এর কথা উল্লেখ করা হলে আর্যদের মাঝে একপ্রকার লজ্জাবোধ কাজ করে। একইভাবে তারা লজ্জিত হয় যখন তাদেরকে এ প্রশ্ন করা হয় যে, পরমেশ্বরের ক্ষমতা ও নৈতিক শক্তি কেন এতটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল, যে দুর্ভাগ্যের কারণে বিবেকের দর্পণে তার ঈশ্বরত্বও প্রমাণিত হয় না আর যে কারণে দুর্ভাগা আর্যরা চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়? মোটকথা, হিন্দুদের পরমেশ্বরের বাস্তবতা ও স্বরূপ হলো, তিনি চারিত্রিক ও ঐশ্বরিক শক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল এবং করুণার পাত্র। সম্ভবত এ কারণেই বেদে পরমেশ্বরের উপাসনা বাদ দিয়ে অগ্নি, বায়ু, চাঁদ, সূর্য এবং পানির উপাসনার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর এগুলোর কাছেই সকল পুরস্কার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর যেহেতু আর্যদেরকে কোনো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না, বরং নিজেই সর্বপ্রকার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থেকে ব্যর্থ অবস্থায় জীবন কাটায়, তাই তার ওপর অন্যদের ভরসা করা স্পষ্টতই ভুল। হিন্দুদের পরমেশ্বরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরার জন্য আমি যতটুকু লিখেছি তা-ই যথেষ্ট।

এখন বাকি থাকল খ্রিষ্টধর্ম- যার সমর্থকরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে নিজেদের তথাকথিত ঈশ্বর যীশু মসীহকে চরম বাড়াবাড়ি করে সত্য খোদা বলে বিশ্বাস করে। খ্রিষ্টানদের খোদার পরিচয় হলো, তিনি একজন ইসরাইলী, ইয়াকূবের কন্যা মরিয়মের পুত্র, যিনি ৩২ বছর জীবন লাভ করে এই নশ্বর ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। যখন আমরা চিন্তা করি যে, গ্রেফতারের সময় রাতভর দোয়া করা সত্ত্বেও কেন তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং লাঞ্চিত হয়ে ধরা পড়েছেন- এরপর খ্রিষ্টানদের

বক্তব্য অনুযায়ী তাকে ত্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং এলী! এলী! করতে করতে মারা গিয়েছেন— তখন সহসা আমাদের শরীর কেঁপে ওঠে। অর্থাৎ যার দোয়াও খোদার দরবারে গৃহীত হয় নি এবং চরম ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতার সাথে মার খেতে খেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন এমন মানুষকে সর্বশক্তিমান খোদা বলতে পারি কি? কিছুটা সে সময়ের চিত্র দৃষ্টিপটে এনে দেখো! যখন যীশু মসীহকে বন্দি অবস্থায় পিলাতের আদালত থেকে হেরোদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। বন্দি হয়ে হাতে হাতকড়া এবং পায়ে শিকল পরানো অবস্থায় কয়েকজন সৈন্যের প্রহরায় তিরস্কৃত-ধিকৃত গালীল অভিমুখে যাত্রা শুরু করে আর চরম লাঞ্ছনাজনক অবস্থায় এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত হয়— খোদা কি এমন হয়ে থাকেন? পিলাত অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর শর্তে তাকে ছেড়ে দিতে চাইলেও তখন তিনি কোনো নিদর্শন দেখাতে পারেন নি। অগত্যা বন্দি অবস্থায় তাঁকে পুনরায় ইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর তারা নিমিষেই তার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়।

পাঠকরা এবার ভেবে দেখুন! এগুলোই কি প্রকৃত ও সত্য খোদার লক্ষণ হয়ে থাকে? সেই সত্তা! যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং অসীম ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী; তিনি অবশেষে এমন দুর্ভাগা, দুর্বল এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় নিপতিত হবেন যে, দুষ্কৃতিকারী লোকেরা তাঁকে নিজেদের হাতে পিষে ফেলবে কোনো পবিত্র বিবেক কি একথা মানতে পারে? কেউ যদি এমন খোদার উপাসনা করে এবং তার ওপর ভরসা করতে চায়, তাহলে তার সেই অধিকার আছে। কিন্তু সত্য কথা হলো, আর্যদের পরমেশ্বরের বিপরীতে যদি খ্রিষ্টানদের ঈশ্বরকে দাঁড় করিয়ে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে পরিমাপ করা হয় তবুও তার (পরমেশ্বরের) তুলনায় এই ঈশ্বর তুচ্ছ প্রমাণিত হবে। কেননা আর্যদের কল্পিত পরমেশ্বর যদিও সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না কিন্তু দাবি করে যে, সৃষ্ট বস্তুগুলোকে কিছুটা হলেও সে জোড়াতালি দিতে পারে। কিন্তু খ্রিষ্টানদের যীশুর মাঝে তো এতটুকু শক্তিও আছে বলে প্রমাণিত হয় নি। যখন ইহুদীরা তাকে ত্রুশবিদ্ধ করে বলেছিল, তুমি যদি এখন নিজেকে রক্ষা করতে পারো তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব। তখন তিনি তাদের সামনে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি অথচ নিজেকে রক্ষা করা তেমন কঠিন কোনো কাজ ছিল না, কেবল নিজের আত্মাকে নিজের দেহের সাথে সংযুক্ত করতে হতো। অতএব

এই অক্ষমের (নিজের আত্মকে) দেহের সাথে জোড়াতালি দেবার শক্তিটুকুও হলো না। তাঁর অনুপস্থিতিতে পালিয়ে থাকা লোকেরা কবরে তাঁর জীবিত হবার কথা রটিয়ে দেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তারা এটিও চিন্তা করে নি, ইহুদীদের দাবি ছিল, আমাদের চোখের সামনে জীবিত হয়ে দেখাও। কিন্তু যখন সে তাদের সম্মুখে জীবিত হতে পারে নি এবং কবরে জীবিত হয়েও তাদের সাথে এসে সাক্ষাৎ করে নি তখন ইহুদীদের দৃষ্টিতে কিংবা কোনো গবেষকের দৃষ্টিতে একথার কী প্রমাণ আছে যে, সত্যিই তিনি জীবিত হয়েছিলেন? যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি মেনেও নেওয়া হয়, কবর থেকে তার লাশ হারিয়ে গেছে তাহলেও এ দ্বারা তার জীবিত হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং বিবেকবানদের কাছে নিশ্চিতরূপে এটাই সাব্যস্ত হবে, গোপনে হয়ত কেউ কারসাজি করে (লাশ) চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকবে।

এমন অনেক মানুষ পৃথিবীতে অতিবাহিত হয়েছে যাদের জাতি কিংবা ভক্তদের এই বিশ্বাসই ছিল যে, তাদের লাশ হারিয়ে গিয়ে তা স্বশরীরে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। তাহলে খ্রিষ্টানরা কি মেনে নেবে, বাস্তবে এমনটিই ঘটেছে? (একথা প্রমাণার্থে) দূরে যেতে হবে না। বাবা (গুরু) নানক সাহেব-সংক্রান্ত ঘটনাবলির প্রতিই দৃষ্টি দাও, অর্থাৎ ১৭ লক্ষ শিখ ভদ্র মহোদয় এ বিষয়ে একমত যে, মৃত্যুর পর তিনি সত্যিই স্বশরীরে জান্নাতে পৌঁছে গেছেন; আর কেবল ঐকমত্যই নয়, বরং সেই যুগে রচিত তাদের নির্ভরযোগ্য পুস্তকাদিতে একথাই লিপিবদ্ধ আছে। এবার খ্রিষ্টান বন্ধুরা মেনে নেবেন কি, আসলেই বাবা নানক স্বশরীরে স্বর্গে গিয়েছেন? পরিতাপ! অন্যদের ক্ষেত্রে দর্শনের কথা খ্রিষ্টানদের খুব মনে থাকে, কিন্তু নিজেদের ঘরের মনগড়া অযৌক্তিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দর্শনকে ধারেকাছেও ভিড়তে দেয় না। যদি খ্রিষ্টান বন্ধুরা কিঞ্চিৎ পরিমাণ ন্যায়পন্থা অবলম্বন করে তাহলে সহসাই বুঝতে পারবে, বাবা নানকের লাশ হারিয়ে যাওয়া এবং স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়া সংক্রান্ত শিখ বন্ধুদের যুক্তিপ্রমাণ খ্রিষ্টানদের মনগড়া কাহিনির চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে, আর নিঃসন্দেহে ইনজীলের যুক্তিপ্রমাণের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়।

কেননা প্রথমত, এই ঘটনা তখনই অর্থাৎ প্রাথমিক যুগেই জনম সাধীতে লেখা হয়েছে। কিন্তু ইনজীল যীশুর যুগের অনেক বছর পরে লেখা হয়েছে। উপরন্তু বাবা নানক সাহেবের ঘটনাটি একদিক থেকে আরো বেশি গুরুত্ব

রাখে, যেমন যীশুর প্রতি যে-সব অলৌকিক নিদর্শন আরোপ করা হয়েছে তা মূলত সেই লাঞ্ছনাকে ঢাকার জন্য বলে মনে হয় যা ইহুদীদের হাতে হাওয়ারীদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা ইহুদীরা যখন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁর কাছে এই নিদর্শন দাবি করে যে, এখন যদি সে ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে আসতে পারে তাহলে আমরা তার প্রতি ঈমান আনব, কিন্তু যীশু ক্রুশ থেকে নামতে পারে নি। কাজেই এ কারণে যীশুর শিষ্যরা চরম লজ্জা পেয়েছিল, এমনকি তারা ইহুদীদের সামনে মুখ দেখানোর যোগ্য ছিল না। ফলে এই লজ্জা আড়াল করার জন্য এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা তাদের জন্য আবশ্যিক ছিল, যেন সরলমনা মানুষের দৃষ্টিতে তিরস্কার, বিদ্রূপ ও হাসি-ঠাট্টা থেকে (তারা) রক্ষা পায়। অতএব এ কথাটি যুক্তিসংগত যে, তারা শুধুমাত্র কলঙ্কের দাগ মোচনের উদ্দেশ্যে নিশ্চিতভাবে এই ছলচাতুরি করে থাকবে। অর্থাৎ রাতের বেলা যীশুর লাশ তাঁর কবর থেকে বের করে অন্য কোনো কবরে রেখে দিয়ে থাকবে, যেভাবে তাদের ওপর অপবাদ আরোপিত হয়েছিল। অতঃপর প্রসিদ্ধ বাগ্‌ধারা ‘চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা’ অনুযায়ী বলে দিয়ে থাকবে যে, দেখো! যেভাবে তোমরা দাবি করতে, যীশু জীবিত হয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি (এরপর) আকাশে চলে গিয়েছেন। যদিও বাবা নানকের মৃত্যুর পর শিখ বন্ধুদের এসব সমস্যা পড়তে হয় নি আর কোনো শত্রু তাদের বিরুদ্ধে এই অপবাদও আরোপ করে নি আর এমন ছলচাতুরির আশ্রয় নেবারও তাদের কোনো দরকার হয় নি। আর ইহুদীরা যেমন হট্টগোল করেছিল যে, লাশ চুরি করা হয়েছে, (তদ্রূপ) কেউ চোঁচামেচিও করে নি। কাজেই খ্রিষ্টান বন্ধুরা যদি যীশু ব্যতিরেকে বাবা নানক সাহেব সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করত তাহলে তা কিছুটা হলেও যুক্তিসংগত হতো, কিন্তু যীশু সম্পর্কে এমন ধারণা সুস্পষ্ট বানোয়াট ও জালিয়াতির দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ।

অবশেষে যীশুর দুঃখযাতনা সহ্য করা ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে এই অজুহাত দেখানো হয় যে, তিনি খোদা হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন যাতে তাঁর মৃত্যু পাপাচারীদের প্রায়শ্চিত্তের কারণ হয়। খোদাও মারা যান— এটিও খ্রিষ্টানদেরই আবিষ্কার। যদিও মৃত্যুর পর তাঁকে পুনর্জীবিত করে তারা আরশে পৌঁছে দিয়েছে এবং এই মিথ্যা ধারণায় আজও লিপ্ত যে, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য আসবেন। যে দেহ তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় পেয়েছেন সেই দেহই ঈশ্বর হিসেবে সর্বদা তাঁর সাথে

থাকবে। কিন্তু খ্রিষ্টানদের এই সাকার খোদা- যিনি তাদের ভাষায় একবার মৃত্যুও বরণ করেছেন আর রক্ত, মাংস, হাড় এবং উর্ধ্বাজ ও নিম্নাঙ্গের সকল অঙ্গ ধারণ করেছেন তিনি হিন্দুদের সেসব অবতারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যাদেরকে বর্তমানে আর্য়সমাজিরা অতি সমারোহে পরিত্যাগ করেছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর তো শুধুমাত্র একবার ইয়াকূবের কন্যা মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু হিন্দুদের ঈশ্বর বিষ্ণু জগতের পাপ মোচনের জন্য নয় বার পুনর্জন্মের কালিমা নিজের ওপর লেপন করেছে। বিশেষত, অষ্টম বার জন্মগ্রহণের গল্প তো খুবই চিত্তাকর্ষক রূপে বর্ণনা করা হয়। যেমন বলা হয়, যখন পৃথিবী দেবতাদের শক্তির মাধ্যমে পরাভূত হয় তখন বিষ্ণু মধ্যরাত্রে কুমারী মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে অবতার রূপধারণ করে আর যে-সব পাপ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল- তা থেকে লোকদের উদ্ধার করে।

যদিও এ গল্প খ্রিষ্টানদের বানোয়াট গল্পের অনুরূপ, কিন্তু হিন্দুরা এক্ষেত্রে খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, খ্রিষ্টানদের ন্যায় নিজেদের অবতারদের ক্রুশবিদ্ধ করে নি আর তাদের অভিশপ্ত হওয়াতেও বিশ্বাসী নয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ইঙ্গিতের আলোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণরাই মানুষকে ঈশ্বর বানানোর রীতি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছে। এরপর এই ধ্যানধারণাই গ্রিকরা হিন্দুদের থেকে (ধার) নিয়েছে। অবশেষে এই ঘৃণ্য বিশ্বাসে উক্ত দুই জাতির উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে যায় খ্রিষ্টানরা। হিন্দুরা অনেক অসম্ভব একটি বিষয় চিন্তা করে যা খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় নি আর তা হলো, হিন্দুরা অনাদি-অনন্ত খোদার প্রাচীন বিধানে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে যে, যখনই পৃথিবী পাপাচারে ভরে যায় তখন অবশেষে তাদের পরমেশ্বরের স্বয়ং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে লোকদের পরিত্রাণ দান করার কথা মনে পড়ে। আর এমন ঘটনা শুধুমাত্র এক বার ঘটে নি, বরং সদা প্রয়োজনের সময়ে হয়ে এসেছে। কিন্তু যদিও খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হলো, ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত কিন্তু আপনি অতীতের গর্ভে যতই হাতড়ান না কেন, সে খোদার সত্তার কোনো সূচনা দেখবেন না। আদি থেকেই তিনি স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালনকর্তাও বটে। কিন্তু তারা একথা বিশ্বাস করে না যে, তিনি চিরদিন থেকে ও অনন্তকাল থেকেই নিজের প্রিয় পুত্রদেরকে মানুষের খাতিরে ক্রুশবিদ্ধ করে আসছেন। বরং বলা হয়, এ কৌশলও অল্প কিছুদিন

হলো তার মনে পড়েছে, সবেমাত্র বর্ষীয়ান পিতার মনে পড়েছে ছেলেকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়ে অন্যদের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

এটি জানা কথা, খোদা অনাদি-অনন্ত চিরকাল থেকে চলে আসছেন যদি মানা হয় তাহলে অন্য আরেকটি কথাও পাশাপাশি মানতে হয় যে, তাঁর সৃষ্টিকুলও শ্রেণিগত দিক থেকে প্রাচীন হবার দরুন চিরকাল ধরে চলে আসছে এবং চিরন্তন গুণাবলির চিরন্তন বিকাশের কারণে কখনো একটি জগৎ শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে আবার কখনো এর পরিবর্তে আরেকটি জগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর কেউ তা গণনা করতে পারবে না যে, কত জগৎকে তিনি এই বিশ্ব থেকে বিলীন করে এর পরিবর্তে ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে ‘আমরা আদমের পূর্বে জিন সৃষ্টি করেছিলাম’ বলে আল্লাহ তা’লা সেই প্রাচীন জগতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যে, বিশ্বের বিভিন্ন সৃষ্ট শ্রেণির প্রাচীন হওয়া অপরিহার্য, এখনও খ্রিস্টানরা এমন কোনো তালিকা উপস্থাপন করে নি যার মাধ্যমে বুঝা যাবে যে, সেসব সীমাহীন জগতের মাঝে যারা পরস্পর সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল, কত বার খোদার পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে? কেননা এটি তো সুস্পষ্ট যে, খ্রিষ্টধর্মের নীতি অনুযায়ী খোদার পুত্র ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিই পাপ থেকে মুক্ত নয়।

অতএব এমতাবস্থায় এ প্রশ্ন ওঠা আবশ্যিক যে, সেই সৃষ্টি যা আমাদের এই আদমেরও পূর্বে অতীত হয়ে গেছে; যাদের এই আদম সন্তানদের ধারার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, তাদের পাপ থেকে মুক্তিলাভের কী ব্যবস্থা হয়েছিল? আর এ পুত্রই কি তাদেরকে পরিত্রাণ দেবার জন্য পূর্বেও কয়েকবার ফাঁসিতে ঝুলেছিল নাকি সে অন্য কোনো পুত্র ছিল, যে অতীতের সৃষ্টির জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে থাকে? আমাদের যতদূর ধারণা, আমরা তো এটি বুঝি যে, যদি ক্রুশ ব্যতিরেকে পাপ ক্ষমা না হয় তাহলে খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের অসংখ্য ও অগণিত পুত্র থাকবে যারা বিভিন্ন সময়ে রণাঙ্গনে কাজে এসে থাকবে আর প্রত্যেককেই নিজেদের সময়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। অতএব এমন ঈশ্বরের কাছে কোনো কল্যাণের আশা রাখা নিরাশা মাত্র যার নিজের যুবক সন্তানরাই প্রাণ হারাতে থাকে।

অমৃতসরের বিতর্ক সভায়ও আমরা এ প্রশ্ন করেছিলাম যে, খ্রিস্টানরা স্বীকার করে, তাদের ঈশ্বর কাউকে পাপের কারণে বিনাশ করতে চান না। তাহলে এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপিত হয়— সেই ঈশ্বর

সেসব শয়তানের অপবিদ্র আত্মাগুলোর পরিত্রাণের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যাদের কথা ইনজীলে উল্লিখিত রয়েছে?*

এমন কোনো পুত্র কি পৃথিবীতে এসেছে, যে শয়তানের পাপাচারের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে কিংবা শয়তানদেরকে পাপ থেকে বিরত রেখেছে। এমন কোনো ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে এ থেকে প্রমাণ হয় যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর শয়তানদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে দণ্ড করবেন বলে সন্তুষ্ট, যাদের সংখ্যা খ্রিষ্টানদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মানবজাতি হতে অধিক। অতঃপর যখন এমন কোনো পুত্রের নিদর্শন দেওয়া হয় নি, এমতাবস্থায় খ্রিষ্টানরা এটি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাদের ঈশ্বর শয়তানদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা, হতভাগা খ্রিষ্টানরা যখন থেকে মরিয়ম তনয়কে ঈশ্বর বানিয়েছে (তখন থেকেই) বড়ো বড়ো সমস্যায় নিপতিত হয়েছে। এমন কোনো দিন নেই, যেদিন তাদের নিজেদের আত্মা তাদের এই বিশ্বাসকে ঘৃণার চোখে না দেখে। এছাড়া আরো একটি সমস্যায় তারা নিপতিত আর তা হলো, বিশ্লেষণ বা গবেষণায় ক্রুশবিদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে প্রমাণিত হয় না এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার কোনো ফলাফলও সামনে আসে না, কেননা ফলাফল কেবল দুই ধরনের হতে পারে।

* নোট: ইসলামী শিক্ষার আলোকে এটি প্রমাণিত যে, শয়তানরাও ঈমান আনয়ন করে। যেমন- আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। মোটকথা, প্রত্যেক মানুষের সাথেই একটি শয়তান থাকে। আর পবিত্র ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির শয়তান ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু পরিতাপ! যীশুর শয়তান ঈমান আনতে পারে নি, বরং উলটো তাকে পথভ্রষ্ট করার পায়তারা করছিল এবং একটি পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে পার্থিব সম্পদের লালসা দেখায় ও টোপ দেয় যে, (আমাকে) সিজদা করলে এসব ধনসম্পদ (তোমাকে) দিয়ে দেবো। আর শয়তানের একথা প্রকৃতপক্ষে একটি বড়ো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আর এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতও ছিল যে, যখন খ্রিষ্টান জাতি তাকে সিজদা করবে তখন পৃথিবীর সকল ধনসম্পদ তাকে প্রদান করা হবে। অতএব বাস্তবেও এমনটিই ঘটেছে, যাদের ধর্মীয় নেতা খোদা আখ্যায়িত হয়েও শয়তানের অনুসরণ করেছে, অর্থাৎ তার পিছু নিয়েছে, তার শয়তানকে সিজদা করার আর কিবা বাকি ছিল। বস্তুত শয়তানকে সিজদা করার কারণেই মূলত খ্রিষ্টানরা ধনসম্পদ লাভ করেছে। আর এটি স্পষ্ট যে, শয়তানী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিজদা করার পর খ্রিষ্টানদেরকে জাগতিক ধনসম্পদ প্রদান করা হয়েছে। -লেখক

১) প্রথমত, এই প্রয়াত পুত্রের ত্রুশবিন্দু হবার চূড়ান্ত কারণ যদি এটি নির্ধারিত হয় যে, তিনি নিজের অনুসারীদের পাপ করার ক্ষেত্রে আরো ধৃষ্ট করে তুলবেন এবং নিজের প্রায়শ্চিত্তের বাতাবরণে অত্যন্ত জোরেশোরে পাপ-পঙ্কিলতা ও সব ধরনের কুকর্ম ছড়িয়ে দেবেন তাহলে এটি তো স্পষ্টতই অযৌক্তিক এবং শয়তানী পন্থা। আমার মতে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে এই পাপাচারমূলক পন্থা পছন্দ করবে এবং যে এহেন পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষকে পাপ করতে অনুপ্রাণিতকারী কোনো ধর্মের প্রবর্তককে পুণ্যবান আখ্যায়িত করবে। বরং অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, এমন ফতোয়া তারা ই প্রদান করে, যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও পবিত্র চালচলন থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের কারণে অন্যদেরকেও নোংরামিতে লিপ্ত করতে চায়। আর এরা প্রকৃতপক্ষে সেসব জ্যোতিষীর সাথে সাদৃশ্য রাখে যারা একটি পথে বসে পথচারীদের প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করে। আর এক এক পয়সার বিনিময়ে নির্বোধ বেচারাদের অত্যন্ত স্বত্তিদায়ক ভাষায় সুসংবাদ দেয় যে, খুব শীঘ্রই তাদের এমন এমন সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে এবং একজন সত্য গবেষক হবার ভান করে তাদের হাতের রেখা এবং চেহারার ছাপ ও অভিব্যক্তিকে খুবই সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে যেন তারা কতক চিহ্নের খোঁজ করছে।

অতঃপর প্রতারণামূলকভাবে প্রদর্শিত একটি বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোকে, যা কেবল এই ধোকা দেবার জন্যই সামনে রাখা থাকে, উলটে পালটে আশ্বাস প্রদান করে যে, সত্যিই প্রশংসারী লোকটির ভাগ্যরাশি এখন তুঙ্গে। হয়ত সে কোনো দেশের বাদশা হয়ে যাবে, নইলে মন্ত্রীত্ব তো থাকবেই। এসব লোক স্থায়ীভাবে নোংরামিতে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে খোদার অনুগ্রহভাজন বানাতে চায়, তারা সেসব আলকেমিস্ট গুরুর ন্যায় যারা একজন সরলমনা কিন্তু ধনী ব্যক্তিকে দেখে বিভিন্নভাবে চাপাবাজি করে বশ করতে চায় এবং নানান কথা বলতে বলতে পূর্বে আগত কিমিতি বা আলকেমিস্টদের তিরস্কার করতে আরম্ভ করে যে, মিথ্যুক, দুবুগুরা অবৈধভাবে চোরের মতো মানুষের সম্পদ প্রতারিত করে হরণ করে আর অবশেষে ধীরে ধীরে কথা এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বলে জনাব! আমি আমার পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে যাকেই রসায়নবিদ হবার দাবিদার দেখেছি তাকেই মিথ্যাবাদী পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, আমার প্রয়াত স্বর্গবাসী গুরু ছিলেন সত্যিকার রাসায়নবিদ। তিনি কোটি কোটি

রূপি দান করে গেছেন। আমার সৌভাগ্য যে, আমি বারো বছর তার সেবা করার সুযোগ পেয়েছি এবং ফলও লাভ করেছি। ফল পাবার কথা শুনে এক নির্বোধ বলে ওঠে, বাবাজি! তাহলে তো আপনি অবশ্যই গুরুজির কাছ থেকে রসায়নের পদ্ধতি শিখে থাকবেন। একথা শুনে বাবাজি কিছুটা কপট অসম্ভষ্ট হয়ে ॐ কুচকে বলে, মিয়া! একথার নামও নিও না, হাজার হাজার লোক জড়ো হয়ে যাবে। আমি তো মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই।

মোটকথা, এ কয়েকটি বাক্যেই মূর্খ ব্যক্তি জালে আটকে যায়, আর জালে আটক শিকারকে জবাই করা কঠিন কিছু নয়। একাকিত্বে গোপন রহস্যের আদলে তাকে বুঝায় যে, আসলে তোমার সৌভাগ্যই আমাকে হাজার ক্রোশ দূর থেকে টেনে এনেছে এবং আমি নিজেও এটি দেখে অবাক হচ্ছি যে, কীভাবে এই কঠিন হৃদয় তোমার জন্য নরম হয়ে গেল। এখন দ্রুত ঘর থেকে কিংবা চেয়ে দশ হাজার (টাকার) স্বর্ণালংকার নিয়ে এসো যা এক রাতেই দশগুণ হয়ে যাবে, কিন্তু সাবধান! কাউকে আমার কথা বলবে না। অন্য কোনো অজুহাতে চেয়ে নেবে। সৎক্ষিপ্ত কথা হলো, অবশেষে অলংকার নিয়ে চম্পট দেয় আর দশগুণ পাবার লোভী উন্মাদরা একা বসে কাঁদতে থাকে। এটি সেই লালসার পরিণাম যা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো হয়। কিন্তু আমি শুনেছি যে, এমন প্রতারকদের এটি অবশ্যই বলতে হয় যে, আমার পূর্বে যারা এসেছে কিংবা পরবর্তীতে যারা আসবে, নিশ্চিত জেনো! তারা সবাই ধোঁকাবাজ ও বাটপার এবং অপবিত্র আর মিথ্যাবাদী আর এ ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে অজ্ঞ। একইভাবে খ্রিষ্টানদের ব্যবসাও ততক্ষণ জমতে পারে না যতক্ষণ তারা হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল পবিত্র নবীকে পাপাচারী এবং দুরাচারী সাব্যস্ত না করে।*

২) এই করুণাযোগ্য ছেলের ত্রুশবিন্দু হবার দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তার শূলে চড়ার মূল উদ্দেশ্য যদি এটি আখ্যা দেওয়া হয় যে, তাঁর ত্রুশবিন্দু

* টীকা: খ্রিষ্টানদের বিবেকবুদ্ধি দেখে দুঃখ হয় যে, তারা তাদের যীশুকে খোদা বানিয়ে তাঁর সত্তার কোনো উপকার করে নি, বরং পুণ্যবানদের সামনে তাঁকে লজ্জিত করেছে। ভালো হতো যদি তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য তারা সদকা দিত আর তার উত্তম পরিণতি জন্য দোয়া করত। মাটির মানুষকে খোদা বানিয়ে কী লাভ হয়েছে? –লেখক

হওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা সকল প্রকার পাপ এবং অপকর্ম থেকে রক্ষা পাবে আর তাদের প্রবৃত্তিগত কামনা-বাসনা প্রকাশ পাবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যেভাবে প্রথম অবস্থাটিও শালীনতা ও সভ্যতা বিবর্জিত এবং সুস্পষ্টভাবে ভুল সাব্যস্ত হয়েছিল, একইভাবে এ অবস্থাটিও পরিষ্কারভাবে মিথ্যাই প্রমাণিত হলো, কেননা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, যীশুর প্রায়শ্চিত্তের বিষয়টি মেনে নেবার মাঝে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে, এর প্রতি সত্য ঈমান আনয়নকারী ফেরেশতা-সদৃশ হয়ে যায় এবং এরপর তার হৃদয়ে পাপের চিন্তাও আসে না, তাহলে বিগত সকল নবীদের সম্পর্কে বলতে হবে যে, তারা যীশুর শূলে চড়া ও প্রায়শ্চিত্তের প্রতি সত্য ঈমান আনয়ন করেন নি, কেননা তারা তো খ্রিষ্টানদের কথা অনুযায়ী পাপের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের মাঝে কেউ মূর্তিপূজা করেছে এবং কেউ অন্যায় রক্তপাত করেছে আবার কেউ নিজ কন্যাদের সাথে অপকর্ম করেছে, আর বিশেষত যীশুর শ্রদ্ধেয় দাদা দাউদ তো সকল প্রকার খারাপ কাজ করেছে। একজন নিরপরাধকে নিজ কামনা চরিতার্থ করার জন্য ধোঁকা দিয়ে হত্যা করিয়েছে এবং পতিতা মহিলাদের দিয়ে তার স্ত্রীকে আনিয়েছে আর তাকে মদ পান করিয়েছে ও তার সাথে ব্যভিচার করেছে। এছাড়াও বিপুল অর্থ হারাম কাজে ব্যয় করেছে এবং সারাজীবন একশটি স্ত্রী রেখেছে। খ্রিষ্টানদের ভাষ্য অনুযায়ী এই আচরণও ব্যভিচারের শামিল এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁর প্রতি প্রতিদিন রুহুল কুদুস বা পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হতো এবং তার প্রতি মহাসমারোহে যবুর অবতীর্ণ হচ্ছিল, কিন্তু পরিতাপ! না পবিত্রাত্মা আর না যীশুর প্রায়শ্চিত্তের প্রতি ঈমান আনা অপকর্ম থেকে তাকে বিরত রাখতে পেরেছে।

পরিশেষে এসব অপকর্মের মাঝেই মৃত্যুবরণ করে আর এর চেয়েও অদ্ভুত কথা হলো, এই কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস মসীহর দাদি এবং নানীদেরকেও অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে পারে নি। অথচ তাদের অপকর্মের ফলে মসীহর চারিত্রিক সৌন্দর্যে কলঙ্কের দাগ লাগে আর এ সকল দাদি ও নানিরা কেবল এক-দুইজন নয়, বরং তিনজন। অতএব যীশুর একজন বুয়ূর্গ নানি যে এক দিক থেকে দাদিও ছিল অর্থাৎ রাহাব ব্যাভিচারিণী ও বেশ্যা নারী ছিল। যিশাইয় ২:১ দ্রষ্টব্য। আর দ্বিতীয় নানি— যে একদিক থেকে দাদিও ছিল, তার নাম হলো তামার। সে পারিবারিকভাবে অপকর্মে লিপ্ত নারীদের ন্যায় ব্যাভিচারিণী ছিল। আদিপুস্তক ৩৮: ১৬-৩০ দ্রষ্টব্য। আর যীশুর এক

নানি- যে সম্পর্কের দিক থেকে দাদিও ছিল এবং বিনতে সাবা নামে পরিচিত। সে সেই সতীসাহসী যে দাউদের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছিল।* ২য় শমুয়েল ১১: ২ দ্রষ্টব্য।

এখন জানা কথা, এই দাদি ও নানিদের যীশুর প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে নিশ্চয় অবহিত করা হয়ে থাকবে এবং তারা এতে বিশ্বাসও করে থাকবে, কারণ এটি তো খ্রিষ্টানদের নীতি যে, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাদের উন্মতকেও কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তের এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছিল আর এর প্রতি ঈমান এনেই তাদের মুক্তি লাভ হয়েছে। অতএব যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার ফলাফল যদি এটি মনে করা হয় যে, তার ক্রুশবিদ্ধ হবার প্রতি ঈমান আনলে মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে যীশুর দাদি-নানিদের ব্যাভিচার ও অপকর্মের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যেখানে খ্রিষ্টানদের ভাষ্য অনুযায়ী সব নবী যীশুর আত্মহত্যা বিশ্বাস করেছিলেন তা সত্ত্বেও অপকর্ম থেকে বাঁচতে পারেন নি আর যীশুর দাদি-নানিরাও বাঁচতে পারেন নি, অতএব এ থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এই মিথ্যা প্রায়শ্চিত্ত প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে থেকে কাউকে বাঁচাতে পারে না এমনকি স্বয়ং যীশুকেও বাঁচাতে পারে নি, দেখো কীভাবে তিনি শয়তানের পদাঙ্ক** অনুসরণ করলেন। অথচ তার শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত ছিল না। আর সম্ভবত এই কারণেই তিনি এতটাই

* নোট: আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার মা থেকে নিয়ে হাওয়া পর্যন্ত আমার মায়েদের ধারাবাহিকতায় কোনো নারী অপকর্মশীল এবং ব্যাভিচারিণী ছিলেন না এবং পুরুষরাও ব্যাভিচারী ও নৈতিকভাবে অপকর্মশীল নয়, কিন্তু খ্রিষ্টানদের ভাষ্যমতে তাদের ঈশ্বর সাহেবের জন্মে তিনজন ব্যাভিচারিণী মহিলার রক্ত মিশে আছে। অথচ তওরাতে ব্যাভিচারী নারীদের সন্তানদের সম্পর্কে যা লেখা রয়েছে— তা কারো অজানা নয়। —লেখক

** টীকা: বর্তমান কালের ইউরোপিয়ান দার্শনিকরা নিজেরা খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও একথা বিশ্বাস করে না যে, বাস্তবেই যীশুকে শয়তান ফুসলিয়ে একটি পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল, কেননা তারা শয়তানের দৈহিক রূপধারণে বিশ্বাসী নয়, বরং স্বয়ং শয়তানের অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী। প্রকৃতপক্ষে এই দার্শনিকদের ধারণাকে উপেক্ষা করলেও একটি আপত্তি অবশ্যই বর্তায় যে, শয়তানের সঙ্গী হবার এ ঘটনাটি যদি ইহুদীদের পাহাড় এবং যাতায়াতের পথে ঘটে থাকত তবে সুনিশ্চিতভাবে কেবল যীশুই নয় বরং অনেক ইহুদীও এই শয়তানকে দেখতে পেত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শয়তান সাধারণ মানুষের

অনুতপ্ত হন যে, এক ব্যক্তি যখন তাকে পুণ্যবান বলে তখন তিনি তাকে পুণ্যবান বলতে বারণ করেছেন! বাস্তবে এমন ব্যক্তি যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল সে কীভাবে নিজেকে পুণ্যবান বলার দুঃসাহস দেখাতে

**** চলমান টীকা:** মতো হবে না, বরং এক কিছুতকিমাকার আকৃতির প্রাণী হবে— যে দর্শকদের অবাক করে। অতএব শয়তান যদি সত্যিই যীশুর জাযত অবস্থায় দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তাকে দেখে হাজার হাজার ইহুদী ও অন্যান্যরা সেখানে জমা হয়ে যেত এবং বিরাট ভিড় লেগে যেত, কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয় নি। এ কারণে ইউরোপিয়ান গবেষকরা এটিকে বাহ্যিক ও বাস্তব কোনো ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, বরং তারা এমনই অহেতুক কাল্পনিক কথাবার্তার জন্য যার মধ্যে ঈশ্বরত্বের দাবিও রয়েছে, ইনজীলের সাথে দূরত্ব বজায় চলে। ইদানীং একজন ইউরোপিয়ান আলেম খ্রিষ্টানদের পবিত্র ইনজীল সম্পর্কে এই মতামত প্রকাশ করে বলেন, আমার মতে ‘ইনজীল মানব রচিত, বরং একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন সৃষ্টি’ একথা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বিশ্বাস করানোর জন্য কেবল এতটুকুই প্রয়োজন যে, সে যেন ইনজীল পাঠ করে। এরপর এই সাহসী পুরুষ বলেন, তোমরা ইনজীল সেভাবে পাঠ করো যেভাবে তোমরা অন্যান্য পুস্তক পাঠ করে থাকো। আর এ সম্পর্কে তেমনি ধ্যানধারণা লালন করো যেমনটি অন্যান্য বইপুস্তকের প্রতি রেখে থাকো। তোমাদের চোখে এর প্রতি যে সম্মান রয়েছে তা তুলে নাও আর নিজেদের হৃদয় থেকে ভয়ের ভূতকে বিতাড়িত করো এবং মস্তিষ্ককে কল্পনামুক্ত করো, এরপর তোমরা পবিত্র ইনজীল অধ্যয়ন করো, তাহলে তোমরা হতবাক হয়ে যাবে যে, তোমরা কী করে ক্ষণিকের তরেও এই অজ্ঞতা ও রচয়িতাকে বুদ্ধিমান ও পুণ্যবান এবং পূত-পবিত্র মনে করেছিলে। একইভাবে আরো অনেক দার্শনিক যারা বিজ্ঞানের জ্ঞান রাখে, যারা ইনজীলকে নিতান্তই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তারা সেসব অপবিত্র শিক্ষার কারণেই (এগুলোকে) ঘৃণা করে* যেগুলো মেনে নেওয়া একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য চরম লজ্জাজনক। উদাহরণস্বরূপ, একটি মিথ্যা গল্প হলো— একজন পিতা, যে কিনা

*** নোট:** খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যতটা দর্শনের উচ্চ মার্গে পৌঁছে ততটাই ইনজীল এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনকি সম্প্রতি এক মেম সাহেবও খ্রিষ্টধর্মের অসারতার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ইসলামী দার্শনিকদের অবস্থা এর বিপরীত। বু আলী সিনা, যিনি একজন নেত্রীস্থানীয় দার্শনিক এবং বিধর্মী আর নাস্তিক বলে খ্যাত, তিনি তার পুস্তক ‘ইশারাত’-এর পরিশিষ্টে লিখেছেন, যদিও দর্শনের যুক্তি দেহ সমবেত হবার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং এর বিপরীত বিশ্বাস রাখে, কিন্তু সত্য সংবাদবাহক (সা.) যেহেতু বলেছেন, তাই আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি।
—লেখক

পারে। এটি নিশ্চিত বিষয় যে, যীশু নিজের ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং আরো কিছু কারণে নিজেকে পুণ্যবান বলা থেকে বিরত ছিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, খ্রিষ্টানরা এখন তাকে কেবল পুণ্যবানই আখ্যা দেয় নি, বরং খোদা

**** চলমান টীকা:** রাগে অগ্নিশর্মা আর সবাইকে ধ্বংস করতে চায়। পক্ষান্তরে একজন পুত্র, যে নিতান্তই দয়ালু, যে তার পিতার উন্মাদনাপূর্ণ ক্রোধ থেকে মানুষকে বাচানোর জন্য নিজেই শূলিতে চড়ল। এখন বেচারী ইউরোপিয়ান গবেষকরা এমন অযৌক্তিক বিষয়াদিকে কীভাবে মেনে নেবে? অনুরূপভাবে খ্রিষ্টানদের অতি সরল ধারণা খোদাকে তিন শরীরে ভাগ করে দেওয়া। একটি হলো সেই দেহ— যা মানুষের আকৃতিতে সর্বদাই বিরাজমান থাকবে, যার নাম ‘ইবনুল্লাহ’। দ্বিতীয়ত সেই দেহ— যা কবুতরের বেশে সর্বদাই বিরাজমান থাকবে, যার নাম ‘রুহুল কুদুস’ (তথা পবিত্রাত্মা)। আর তৃতীয়ত সেই দেহ— যার ডান পাশে পুত্র গিয়ে বসেছে। এখন কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এই ত্রিতনু বিশিষ্ট খোদাতে কীভাবে বিশ্বাস করবে! কিন্তু শয়তানের সাহচর্যের অপবাদ ইউরোপিয়ান দার্শনিকদের কাছে কম হাসির বিষয় নয়। অনেক চেষ্টার পর এই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এসব অবস্থা মসীহর মানসিক বৃত্তির নিজেরই সৃষ্ট বিষয় ছিল আর তারা একথাও বিশ্বাস করে, সুস্থ অবস্থায় এমন জঘন্য চিন্তা মাথায় আসতেই পারে না। বহু মানুষের এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, মৃগীরোগে আক্রান্তরা অধিকাংশ সময় শয়তানকে এভাবেই দেখে থাকে। তারা হুবহু এভাবেই বর্ণনা করে থাকে যে, আমাকে শয়তান অমুক অমুক জায়গায় নিয়ে গিয়েছে এবং এই এই বিস্ময়কর বিষয়াবলি ঘটিয়েছে। খুবসম্ভব ৩৪ বছর অতিবাহিত হয়েছে— আমার স্মরণ আছে, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, এক স্থানে কালো ও কুৎসিত শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত, সে আমার দিকে তাকায়, তখন আমি তার মুখে থাপ্পড় মেরে বললাম, হে শয়তান! দূর হও; আমার সাথে তোর কী কাজ? তখন সে অন্য আরেকজনের কাছে যায় এবং তাকে নিজের সাথে নিয়ে নেয়। যাকে সে নিজের সাথে নিয়ে যায় তাকে আমি জানতাম। ততক্ষণে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেদিনই বা তার কিছুদিন পর আমার স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি, শয়তান যাকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে ভুগতে থাকে। এ থেকে আমার বিশ্বাস জন্মায় যে, শয়তানের সঙ্গী হবার অর্থ হলো মৃগীরোগে আক্রান্ত হওয়া। সুতরাং এটি নিতান্তই সূক্ষ্ম ও গূঢ় এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ অভিমত যে, যীশু প্রকৃতপক্ষে মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং এই কারণেই এ ধরনের স্বপ্ন দেখতেন। আর ইহুদীদের এই অপবাদ এই অভিমতের সমর্থনকারী এবং সঠিক বলে মনে হয় যে, তুমি বা’ল যাবুলের সহায়তায় এমন কাজ করে থাকো, কেননা বা’ল যাবুল-ও শয়তানেরই নাম। ইহুদীদের কথা এ কারণেও সঠিক ও সম্ভব বলে মনে হয় যে, যারা শয়তানের ভয়ে মারাত্মকভাবে ভীত হয় এবং শয়তানও তাদেরকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে, তখন যদিও তাদের নিজেদের মৃগীরোগ ইত্যাদি ভালো হয় না, কিন্তু অন্যদেরকে

বানিয়ে বসেছে। মোটকথা, কাফ্ফারা তথা প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং মসীহর সন্তরাও কোনো উপকার সাধন করতে পারে নি। সকল পাপের মূল অহংকার ও দাঙ্কিতা যীশুর ভাগেই এসেছে বলে মনে হয়, কেননা তিনি নিজে খোদা সেজে

**** চলমান টীকা:** ভালো করতে পারে, কেননা শয়তান তাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদের থেকে পৃথক হতে চায় না; কিন্তু একান্ত ভালোবাসার কারণে তাদের কথা মেনে নেয় এবং অন্যদেরকে তাদের খতিরে শয়তানী রোগব্যাদি থেকে পরিত্রাণ দেয়। এরূপ কর্মে অভ্যস্ত ব্যক্তি সর্বদাই মদ ও অপবিত্র বস্তু ব্যবহার করতে থাকে এবং প্রথম শ্রেণির মদ্যপ ও পেটুক হয়ে থাকে। সপ্তকাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে, এক ব্যক্তি এভাবেই ‘ফিট বা অজ্ঞানতা’-র রোগে আক্রান্ত ছিল। বলা হয়, সে অন্য লোকদের মধ্য থেকে জিন বের করে দিত। মোটকথা, যীশুর শয়তানের সাহচর্যের এ ঘটনা তার মৃগীরোগে আক্রান্ত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর আমাদের কাছে বহু প্রমাণ রয়েছে যেগুলো বিস্তারিত লেখারও প্রয়োজন নেই এবং দৃঢ়বিশ্বাস রাখি, খ্রিষ্টান গবেষকরা একথা অস্বীকার করবে না, যারা পূর্ব থেকেই আমার এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত। আর যে-সব নির্বোধ পাদরি অস্বীকার করবে তাদের এ বিষয়ের প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত যে, যীশুর শয়তানের সাথে যাওয়া মূলত জাহ্নত অবস্থার একটি ঘটনা—* মৃগী ইত্যাদিতে আক্রান্ত হবার কারণে নয়। কিন্তু প্রমাণ দিতে গিয়ে যারা চান্দ্রুষ দেখার কথা বলবে

*** নোট:** এখন প্রশ্ন হলো, কে কে শয়তানকে যীশুর সাথে দেখেছে?

কোনো ভালো মানুষ অতীতের পুণ্যবানদের অসম্মান করে না, কিন্তু তিনি নিষ্পাপ নবীগণকে ডাকাত ও বাটপার নামে অভিহিত করেছেন। তার মুখে অন্যদের জন্য সর্বদা বেইমান ও ব্যভিচারী শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, কারো সম্পর্কে শালীন শব্দ ব্যবহার করেন নি। কেনইবা হবে না, তিনি যে খোদার পুত্র! আর যখন দেখি যীশুর প্রায়শ্চিত্ত হাওয়ারিদের হৃদয়ে কীরূপ প্রভাব ফেলেছে? তারা কি এতে ঈমান এনে পাপ থেকে বিরত হয়েছে? সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সত্যিকার পবিত্রতার ময়দান শূন্য দৃষ্টিগোচর হয়। এটি তো স্পষ্ট যে, তারা ক্রুশবিদ্ধ হবার খবর শুনে ঈমান এনেছিল, কিন্তু তবুও ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যীশু আটক হবার পর পিতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিসম্পাত করে এবং অন্য সবাই পালিয়ে যায় এবং কারো হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে নি। এরপর পাপ থেকে বিরত থাকার চিত্র— যা বিশেষভাবে ইউরোপের গবেষকদের স্বীকারোক্তি থেকে প্রমাণিত তা হলো, ইউরোপে ব্যভিচারের বন্যা এতটা খরশ্রোতা যে, কেবল লন্ডনেই প্রতি বছর হাজার হাজার অবৈধ সন্তান জন্ম নেয় এবং ইউরোপের এমন এমন নোংরা অপকর্মের কথা ছেপেছে যা বলার ও শোনার যোগ্য নয়। মদ্যপানের এতটা ব্যাপকতা রয়েছে যে, সেই দোকানগুলোকে যদি একটি সরলরেখায় পাশাপাশি রাখা হয়

নবীগণকে দস্যু, বাটপার এবং অপবিত্র ব্যক্তি আখ্যায়িত করেছেন। অথচ তার স্বীকারোক্তি হতে এটিই প্রকাশ পায় যে, তিনি নিজেও পুণ্যবান নন। কিন্তু পরিতাপ যে, অহংকারের প্লাবন তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

**** চলমান টীকা:** তাদের নির্ভরযোগ্য সাক্ষী উপস্থাপন করা উচিত। পায়রার অবতরণ আর এটি বলা যে, তুমি আমার প্রিয় পুত্র— প্রকৃতপক্ষে এটিও মৃগী রোগের খিঁচুনি ছিল যার সাথে এমন ধারণাসমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকবে। প্রকৃত বিষয় হলো, পায়রার রং শুভ্র হয়ে থাকে আর শ্লেষ্মার রং-ও শুভ্র হয়। মৃগীর উৎস শ্লেষ্মাই হয়ে থাকে। সুতরাং শ্লেষ্মা কবুতরের আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয়। আর এটি বলা যে, তুমি আমার পুত্র; এর রহস্য হলো, মৃগীতে আক্রান্ত রোগী বাস্তবে মৃগীরোগেরই পুত্র হয়ে থাকে। এজন্য মৃগীকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘উম্মুস্ সিবইয়ান’ অর্থাৎ ‘বাচ্চাদের মা’ বলা হয়ে থাকে। একবার যীশুর আপন চার ভাই-ই তৎকালীন সরকারের নিকট আবেদন করেছিল যে, এই ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে, এর কোনো ব্যবস্থা করা হোক। অর্থাৎ তাকে জেলে বন্দি করা হোক যেন স্থানীয় রীতি অনুযায়ী তার চিকিৎসা করা হয়। সুতরাং এ আবেদনও এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, যীশু মূলত মৃগীরোগের কারণে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। —লেখক

*** চলমান নোট:** তাহলে হয়ত একজন পথচারি দুই মঞ্জিল দূরত্ব অতিক্রম করার পরও সেই দোকানগুলোর সারি শেষ হবে না। ইবাদত বাদ দিয়ে দিন-রাত মানুষ বিলাসিতা ও জগৎপূজায় লিপ্ত। অতএব এসব পর্যালোচনা থেকে এটি প্রমাণ হয় যে, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার মাধ্যমে এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা পাপ থেকে বিরত হতে পারে নি।* বরং যেভাবে বাঁধ ভেঙে গেলে এক খরশোতা নদীর পানি আশপাশের গ্রামকে ধ্বংস করে দেয়, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অবস্থা। আমি জানি, খ্রিষ্টানরা এই বিষয় নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক করবে না; কেননা যেখানে সেসব নবীদের, যাদের নিকট খোদা তা’লার ফেরেশতা আগমন করত, মসীহর প্রায়শ্চিত্ত অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে নি; সেখানে ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী ও (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃত পাদরিদেরকে কীভাবে অপবিত্র কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে? বস্তুত এটিই খ্রিষ্টানদের খোদার প্রকৃত স্বরূপ যা আমি বর্ণনা করেছি।

*** নোট:** যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া যদি নিজ ইচ্ছায় হতো তবে তা আত্মহত্যা এবং নিষিদ্ধ মৃত্যু ছিল। আর যদি অনিচ্ছায় হয় তাহলে তা কাফ্ফারা তথা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। যীশু নিজে পুণ্যবান হবার দাবি করতে পারেন নি, কেননা লোকজন অবগত ছিল যে, এই ব্যক্তি মাদকাসক্ত; আর এই মন্দ চালচলন খোদা হবার পরের নয়, বরং সূচনা থেকেই ছিল বলে মনে হয়। সুতরাং খোদা হবার দাবি করা মদ্যপানেরই একটি মন্দ পরিণাম। —লেখক

এই দুটি ধর্মের বিপরীতে যার উল্লেখ এখনই আমি করেছি, তৃতীয় ধর্ম হলো ইসলাম। এ ধর্মে খোদা অন্বেষণের পন্থা অত্যন্ত স্পষ্ট ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সকল ধর্মের পুস্তকাবলি যদি বিনষ্ট হয়ে যায় আর সেগুলোর সকল শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ধ্যানধারণা ও মতবাদও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবুও সেই খোদা যাঁর প্রতি কুরআন পথপ্রদর্শন করে প্রাকৃতিক নিয়মের দর্পণে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হবেন এবং তাঁর শক্তি ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ মুখাবয়ব প্রতিটি অণুপরমাণুতে সমুজ্জ্বল দেখা যাবে। সুতরাং কুরআন মজীদ যে খোদার পরিচয় প্রদান করে তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের ওপর শাস্তিমূলক রাজত্ব করেন না, বরং

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوا بَلَىٰ

[অর্থাৎ ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু নই?’ তারা বলে, ‘হ্যাঁ।’ (আল-আরাফ: ১৭৩) –অনুবাদক] আয়াত অনুযায়ী প্রতিটি অণুপরমাণু নিজ প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। তাঁর প্রতি বিনত হবার জন্য প্রতিটি প্রকৃতিতে এক আকর্ষণ বিদ্যমান। কোনো একটি অণুপরমাণুও এই আকর্ষণের বাইরে নয়। এটি এ বিষয়েরই একটি বড়ো প্রমাণ যে, তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। কেননা হৃদয়ের জ্যোতি এই বিষয়টি স্বীকার করে যে, সেই আকর্ষণ যা তাঁর (বা খোদার) দিকে বিনত হবার জন্য প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান নিঃসন্দেহে সেটি তাঁর (তথা খোদার) পক্ষ থেকেই প্রদান করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে আয়াত—

إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

(বনী ইসরাঈল: ৪৫)

—এ এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু তাঁর পবিত্রতা ও তাঁর স্তুতি বর্ণনা করছে। যদি খোদা তা’লা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা না হতেন তাহলে এসব বস্তুর মাঝে খোদা তা’লার প্রতি আকর্ষণ কেন পাওয়া যায়? একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি অবশ্যই একথা মানতে বাধ্য যে, কোনো সুপ্ত সম্পর্কের কারণে এই আকর্ষণ রয়েছে। সুতরাং সেই সম্পর্ক যদি খোদা তা’লার সৃষ্টিকর্তা হওয়া না হয় তাহলে কোনো আর্ষসমাজি প্রমুখ এর উত্তর প্রদান করুক যে, বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্পর্কের কী চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটির নাম কী? এটিই কি সত্য যে, খোদা তা’লা কেবল জোরপূর্বক

প্রতিটি বস্তুর ওপর রাজত্ব করছেন? আর সেসব বস্তুর মাঝে খোদা তা'লার দিকে বিনত হবার জন্য কোনো ধরনের প্রকৃতিগত শক্তি ও আগ্রহ নেই? আল্লাহ্ ক্ষমা করুন! মোটেই এমন নয়, বরং এমন ধারণা করা কেবল মূর্খতাই নয় বরং অতি নিম্ন পর্যায়ের নোংরামিও বটে। পরিতাপ! আর্য়সমাজিদের বেদ খোদা তা'লার স্রষ্টা হওয়াকে অস্বীকার করে সেই আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে স্বীকার করে নি, যার ওপর প্রতিটি বস্তুর প্রকৃতিগত আনুগত্য নির্ভরশীল। আর যেহেতু সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সূক্ষ্মজ্ঞান থেকে তারা হাজার হাজার ক্রোশ দূরে তাই এই সত্য দর্শন তাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় যে, নিশ্চয় সেই চিরস্থায়ী সত্তার সাথে প্রতিটি বস্তু ও আত্মার এক প্রকৃতিগত সম্পর্ক রয়েছে। খোদা তা'লার রাজত্ব কেবল বানোয়াট ও জবরদস্তিমূলক রাজত্ব নয়, বরং প্রতিটি বস্তু আত্মিকভাবে তাঁকে সিজদা করছে।

কেননা প্রতিটি অণুপরমাণু তাঁর অগণিত অনুগ্রহরাজির মাঝে নিমজ্জিত ও তাঁর হাত দ্বারা নির্মিত। কিন্তু পরিতাপ! সকল বিরোধী ধর্মাবলম্বীরা খোদা তা'লার অসীম ক্ষমতা ও দয়া এবং পবিত্রতাকে হৃদয়ের সংকীর্ণতার কারণে জোরপূর্বক রুদ্ধ করতে চেয়েছে। আর এসব কারণেই তাদের কল্পিত সকল খোদা দুর্বলতা, অপবিত্রতা, কৃত্রিমতা, অযথা ক্রোধ ও অবৈধ শাসনের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু ইসলাম খোদা তা'লার পরিপূর্ণ গুণাবলির খরশোতা শ্রোতস্বিনীকে কোথাও বাধাগ্রস্ত করে নি। এটি আর্য়দের ন্যায় এ বিশ্বাসের শিক্ষা প্রদান করে না যে, পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমস্ত আত্মা ও বস্তুর অণুপরমাণু নিজ নিজ সত্তায় নিজেরাই খোদা আর যাকে পরমেশ্বর আখ্যা দেওয়া হয় তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে কেবল এক বাদশার ন্যায় সেগুলোর ওপর রাজত্ব করেন।

অপরদিকে খ্রিষ্টধর্মের ন্যায় এ শিক্ষাও প্রদান করে না যে, খোদা মানুষের ন্যায় এক নারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। নয় মাস পর্যন্ত রজঃস্রাব ভক্ষণ করে এক পাপীষ্ঠ দেহ নিয়ে যা সাবা-র কন্যা, তামার ও রাহাবের ন্যায় ব্যভিচারিণী নারীর উপাদান থেকে নিজ সত্তায় পুত্রত্বের অংশ রাখত আর রক্ত, হাড় ও মাংস গঠন, বরং শৈশবে রোগব্যাদির যে কষ্ট রয়েছে যেমন- জলবসন্ত, গুটিবসন্ত ও দাঁতের রোগ প্রভৃতি কষ্টের সবই তিনি সহ্য করেছেন অর্থাৎ জীবনের একটি বৃহৎ অংশ সাধারণ মানুষের ন্যায় অতিবাহিত করে পরিশেষে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে ঈশ্বরত্বের কথা মনে পড়ে। কিন্তু যেহেতু তার দাবি কেবল

বুলিস্বর্বশ্য দাবি ছিল এবং খোদা তা'লার শক্তি সাথে ছিল না তাই দাবি করার সাথে সাথে ধৃত হয়েছে। বরং ইসলাম এসব দুর্বলতা এবং অপবিত্র অবস্থা থেকে মহা প্রতাপান্বিত সত্য খোদাকে পূত-পবিত্র মনে করে এবং তাঁর সন্তাকে সেই পশুসুলভ ক্রোধের উর্ধ্বে জ্ঞান করে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো গলায় ফাঁসির রশি না পরানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের ক্ষমার জন্য কোনো পথ তাঁর স্মরণ হয় না— ইসলাম এমনটি নয়। পক্ষান্তরে খোদা তা'লার সন্তা এবং গুণাবলি সম্পর্কে কুরআন করীম এই সত্য ও পবিত্র এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে, তাঁর ক্ষমতা, দয়া, মর্যাদা ও পবিত্রতার কোনো সীমা নেই অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষার আলোকে একথা বলা অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় যে, খোদা তা'লার ক্ষমতা, মর্যাদা এবং কৃপারাজি একটি নির্দিষ্ট সীমায় গিয়ে থেমে যায় অথবা কোনো উপলক্ষ্যে পৌঁছে তাঁর দুর্বলতা তাঁর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বরং তাঁর সমস্ত শক্তিমত্তা এই সুদৃঢ় নিয়মের অধীনে চলছে— সেসব বিষয়াদি ব্যতীত, যা তাঁর পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলির বিরোধী কিংবা তাঁর অপরিবর্তনীয় প্রতিশ্রুতিসমূহের বিরোধী। এছাড়া তিনি যা চান করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, এটি বলা যাবে না যে, তিনি স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন; কেননা এ বিষয়টি তাঁর আদি গুণ 'হাইয়্যুন' ও 'কাইয়্যুম'-এর বিরোধী আর এর কারণ হলো, তিনি পূর্বেই তাঁর কথা ও কার্য দ্বারা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি অনাদি-অনন্ত, অবিনশ্বর আর মৃত্যু তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তদ্রূপ এটিও বলা যাবে না যে, তিনি কোনো নারীর গর্ভে প্রবেশ করেন, রজঃশ্রাব ভক্ষণ করেন এবং প্রায় নয় মাস পূর্ণ করে এক বা দেড় কেজি ওজন নিয়ে নারীর যোনি থেকে ক্রন্দনরত অবস্থায় জন্ম নেন আর এরপর পানাহার করেন, মলমূত্র ত্যাগ করেন এবং এ অস্থায়ী জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন আর পরিশেষে কয়েক ঘণ্টা প্রাণহারী শাস্তি ভোগ করে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কেননা এই সমস্ত বিষয় দুর্বলতা ও ক্রটিবিচ্যুতির পরিচায়ক এবং তাঁর আদি প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থি।

অতঃপর এটিও জানা থাকা উচিত, যেহেতু ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকৃত অর্থে খোদা তা'লা পুরো সৃষ্টির স্রষ্টা আর সকল আত্মা ও দেহ তাঁরই সৃষ্ট এবং তাঁরই ক্ষমতাবলে অস্তিত্ব লাভ করেছে; অতএব কুরআনী বিশ্বাস এটিও যে, খোদা তা'লা যেভাবে সবকিছুর প্রস্তুতকারী ও স্রষ্টা, একইভাবে তিনি বাস্তবে ও সত্যিকার অর্থে সবকিছুর স্থিতিদাতা-ও অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের

ওপরই প্রতিটি বস্তুর স্থায়ীত্ব নির্ভর করে এবং তাঁর সত্তা প্রতিটি বস্তুর প্রাণস্বরূপ আর যদি মনে করা হয় যে, তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে পারে তাহলে একইসাথে সবকিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মোটকথা, সকল অস্তিত্বের জীবন ও স্থায়ীত্বের জন্য তাঁর সাথে থাকা আবশ্যিক। কিন্তু আর্য এবং খ্রিষ্টানরা এ বিশ্বাস পোষণ করে না। আর্যরা এ কারণে যে, তারা খোদা তা'লাকে আত্মা ও দেহের সৃষ্টিকর্তা মনে করে না এবং প্রত্যেক বস্তুর সাথে তাঁর এরূপ সম্পর্ক তারা মানে না যার ফলে প্রমাণিত হবে যে, প্রতিটি বস্তু তাঁরই ক্ষমতা এবং ইচ্ছার ফসল আর তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য ছায়াস্বরূপ। বরং তারা প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বকে এমনভাবে স্থায়ী মনে করে যার ফলে মনে হয় যে, তাদের ধারণা অনুসারে সমস্ত বস্তুনিচয় নিজ গুণে স্থায়ীভাবে অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং যখনকিনা বিদ্যমান সব বস্তু তাদের ধারণানুযায়ী খোদা তা'লার ক্ষমতাবলে অস্তিত্ব লাভ করে নি ও তাঁর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই নিঃসন্দেহে এসব বস্তুনিচয় হিন্দুদের পরমেশ্বরের সাথে এতটা সম্পর্কহীন যে, যদি তাদের পরমেশ্বরের মৃত্যুও ধরে নেওয়া হয় তথাপি আত্মা ও দেহের কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা তাদের পরমেশ্বর কেবল রাজমিস্ত্রির ন্যায়। যেভাবে ইট, সিমেন্ট ও বালু রাজমিস্ত্রির ব্যক্তিগত দক্ষতার গুণে সেগুলোর স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ এগুলো সর্বাবস্থায় রাজমিস্ত্রির সত্তার অধীনে থাকে না; একই অবস্থা হিন্দুদের পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুনিচয়েরও। যেভাবে রাজমিস্ত্রি মারা গেলে এটি আবশ্যিক নয় যে, সে তার জীবদ্দশায় যত দালান বানিয়েছে তা সাথে সাথে ধ্বংসে পড়বে। অনুরূপভাবে এটিও আবশ্যিক নয় যে, হিন্দুদের পরমেশ্বর মারা গেলে অন্যান্য বস্তুর কোনো কষ্ট হবে, কেননা তিনি তাদের কাইয়ুম* (অর্থাৎ স্থিতি ও স্থায়ীত্বদাতা) নন।

যদি কাইয়ুম হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তাও হতেন, কেননা যে-সব বস্তু সৃষ্টি হবার ক্ষেত্রে খোদা তা'লার শক্তির মুখাপেক্ষী নয় তা নিজ অস্তিত্বের স্থায়ীত্বের জন্যও তাঁর শক্তির মুখাপেক্ষী নয়। অপরদিকে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তাদের সাকার খোদা কাইয়ুমুল আশইয়া (স্থিতিদাতা) হতে পারেন না, কেননা কাইয়ুম হবার জন্য সাথে থাকা আবশ্যিক

* নোট: যে বস্তু ঐশী ক্ষমতার সহায়তায় সৃষ্টি হয় নি, তা নিজ অস্তিত্বের জন্য সেই ক্ষমতার মুখাপেক্ষী নয়। -লেখক

আর জানা কথা, খ্রিষ্টানদের খোদা যীশু এখন পৃথিবীতে নেই। কেননা পৃথিবীতে থাকলে মানুষ অবশ্যই তাকে দেখতে পেত যেভাবে সেই যুগে দেখা যেত যখন পিলাতুসের শাসনকালে তাঁর দেশে সে ছিল। যেহেতু তিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই তাই পৃথিবীবাসীর কাইয়ুম কীভাবে হতে পারেন? বাকি রইল আকাশের বিষয়— তিনি আকাশেরও কাইয়ুম নন, কেননা তার দেহাকৃতি শুধুমাত্র ছয়-সাত বিঘতের কাছাকাছি হবে। তাহলে তিনি পুরো আকাশে কীভাবে বিদ্যমান থাকতে পারেন যার ফলে তিনি তাদের কাইয়ুম হতে পারেন।

কিন্তু আমরা যে খোদা তা'লাকে 'রাব্বুল আরশ' বলে থাকি, এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি দেহধারী বা সাকার এবং আরশের মুখাপেক্ষী, বরং আরশের অর্থ সেই পবিত্র সুউচ্চ স্থান যা ইহজগৎ এবং পরজগতের সাথে সমভাবে সম্পর্ক রাখে। খোদা তা'লা আরশে অধিষ্ঠিত বলার অর্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে তিনি দুই জগতেরই মালিক। যেভাবে কোনো ব্যক্তি কোনো উঁচু স্থানে বসে অথবা কোনো সুউচ্চ প্রাসাদে চড়ে ডানে ও বামে দৃষ্টি রাখে তদ্রূপ রূপকভাবে খোদা তা'লাকে উঁচু থেকে উচ্চতর সিংহাসনে আসীন মনে করা হয়েছে; ইহজগৎ কিংবা পরজগতের কোনোকিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই। অবশ্য এ মর্যাদাকে সাধারণ মানুষের বুঝার জন্য 'ওপরে' বলে উল্লেখ করা হয়। যেহেতু খোদা তা'লা প্রকৃতপক্ষেই সবার ওপরে এবং সকল বস্তু তাঁর পায়ে লুটিয়ে আছে তাই ওপরের দিকের সাথে তাঁর সত্তার একটি সামঞ্জস্য রয়েছে, কিন্তু ওপরে তিনিই অধিষ্ঠিত যার নীচে উভয় জগৎ বিদ্যমান আর তিনি এক শীর্ষবিন্দু বা চূড়ার ন্যায় যার নীচে দুই মহাজগতের দুটি শাখা উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি শাখা সহস্র জগতের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলোর জ্ঞান সেই সত্তা ছাড়া অন্য কারো নেই যিনি সেই শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত। সেই শীর্ষবিন্দুর নাম হলো 'আরশ'। তাই বাহ্যিকভাবেও সেই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থান যা ওপরের দিকে শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত বলে জ্ঞান করা হয়, যা উভয় জগতের উর্ধ্বে রয়েছে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিই 'আরশ' নামে অভিহিত। এই উচ্চতা ও মাহাত্ম্য স্রষ্টার ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতার নিরিখে, যেন তা একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনি সকল কল্যাণের উৎস এবং সকল বিষয়ের প্রত্যাবর্তনস্থল এবং সকল সৃষ্টির পূজনীয়। নিজ সত্তায়, গুণাবলিতে এবং উৎকর্ষতায় তিনি সবার উর্ধ্বে। কুরআন বলে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান যেমনটি বলা হয়েছে—

أَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

অর্থাৎ যদিকেই মুখ করবে সেদিকেই খোদার পবিত্র চেহারা বিদ্যমান
(আল-বাকারা: ১১৬)।

আবার বলা হয়েছে—

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সাথে আছেন (আল-
হাদীদ: ৫)।

অন্যত্র বলা হয়েছে—

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

অর্থাৎ আমরা মানুষের জীবনশিরা থেকেও তার অধিক নিকটে আছি
(কাফ: ১৭)।

এ হলো উপরোক্ত তিন প্রকার শিক্ষামালার দৃষ্টান্ত।

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

[যে হিদায়াতের অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। -অনুবাদক]

সমাপ্ত

লিপিকার অধম অক্ত

১ ডিসেম্বর ১৮৯৫, রবিবার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুরীদ—

গোলাম মুহাম্মদ অমৃতসরী, আল্লাহ্ তা'লা তাকে মার্জনা করুন।

Mi'yarul Mazahib

(The Criterion for Religions)

The Criterion for Religions, the Bangla translation of Mi'yarul Madhahib written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) of Qadian in 1895 makes a detailed comparison of three major religions– Hinduism, Christianity and Islam– from the standpoint of natural criterion as to why Hinduism and Christianity fail to present the Perfect and Omnipotent God as proclaimed by Islam.

God of Hinduism has only limited powers. His role is just like that of a mason who joins only already existing things and enjoys no role as a Creator. God of Christianity went through all the travails of life. That their God died for the sins of his followers is yet another invention of Christians. The idea of deifying humans was invented by Brahmans from whom the idea was borrowed by Greeks and was in turn borrowed by Christians from Greeks. The Christian dogma of Atonement only encourages to commit sins, to freely spread sinfulness, impiety and every kind of evil.

As against the views of Hinduism and Christianity about God. 'Islam's understanding of God', according to the author, 'is very simple and clear, and is in keeping with human nature. Even if the books of all other religions were to disappear along with all their teachings and concepts, God– towards Whom the Holy Quran leads would still be clearly reflected in the mirror of the laws of nature and His might and wisdom shall be found glowing in every particle. This claim is fully substantiated in the book which covers many important aspects of Islamic concept of God.

ISBN 978-984-991-071-8



9789849910718